# ভারতীয় ব্যাঙ্ক: কিছু কথা কিছু প্রশ্ন

ঐতিহাসিক ভাবে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্ব - ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার আগে, দ্বিতীয় পর্ব - ১৯৪৭ থেকে ১৯৯১ এবং তৃতীয় পর্ব ১৯৯১ সালের পর।

**প্রথম পর্ব**

প্রথম ভারতীয় ব্যাঙ্ক 'ব্যাঙ্ক অফ হিন্দুস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৭০ সালে এবং ১৮৩২ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। ইতিমধ্যে বেশ কিছু নতুন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয় – এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পাঞ্জাব ন্যশনাল ব্যাঙ্ক ইত্যাদি, যেগুলো এখনও চালু আছে। এই সময়ের প্রধান ঘটনা ছিল অনেক ব্যাঙ্কের একীকরণ। ব্যাঙ্ক অফ মাদ্রাজ, ব্যাঙ্ক অফ বোম্বাই এবং ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক যাদের কাগজ মুদ্রা ছাপানোর একচেটিয়া অধিকার ছিল, ২৭ জানুয়ারি ১৯২১ একীভূত হয়ে 'ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া' গঠিত হয়। যদিও এটি মূলতঃ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ছিল, সরকারি প্রয়োজনও কখনো কখনো মেটাতে হত। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আর্থিক মন্দার কারণে বিশেষভাবে সরকারি ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া' গঠিত হয় ১৯৩৫ সালের ১ এপ্রিল এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ শুরু করে। ফলে ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক সাধারণ ব্যাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে পরিণত হয়। ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৯ অনুসারে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ হয়। এর পরে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আইন অনুসারে ১৯৫৫ সালের ১ জুলাই 'ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া' স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নামে পরিচিত হয়।

বিংশ শতাব্দীতে ব্যাঙ্ক একীকরণের অনেক ঘটনা ঘটে। ১৯৫০ সালে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং হুগলি ব্যাঙ্ক একত্রিত হয়ে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া গঠিত হয়। ষাটের দশকে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের সাথে মিলিত হয় রায়লসিমা ব্যাঙ্ক, মান্নারগুড়ি ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ আলাগাপুরি, সালেম ব্যাঙ্ক এবং ত্রিচি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক। ১৯৩৩ সালে টাটা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক এবং অ্যালায়েন্স ব্যাঙ্ক অফ সিমলা, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সাথে মিলিত হয়।

**দ্বিতীয় পর্ব**

এই পর্বে ১৯ জুলাই ১৯৬৯ অধ্যাদেশ জারি করে ভারত সরকার ১৪ টি বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করে। দ্বিতীয় দফায় ১৯৮০ সালে আরও ছয়টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হয়, ফলে ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রায় ৯১% সরকারি নিয়ন্ত্রণে আসে। জাতীয়করণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঋণ বিতরণে সরকারি নিয়ন্ত্রণ। সরকার বিভিন্ন দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প প্রণয়ন করে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ ও দরিদ্র ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধের দায় লাঘব করার জন্য সহজ কিস্তি, কম সুদ ও ভর্তুকির ব্যবস্থা করেছিল। কোন কারণ ছাড়া এত বড় একটা অর্থনৈতিক সংস্কার হয়নি, প্রেক্ষাপট আগেই তৈরি ছিল। ১৯৬২ এবং ১৯৬৫ সালে চিন ও পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি চাপের মুখে পড়ে। দেশ জুড়ে ক্রমবর্ধমান দ্রব্য মূল্য, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক স্থবিরতা এবং খাদ্য সংকটের ফলে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত আন্দোলনে সামিল হলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রামাঞ্চলে শুরু হয় সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন। ইতিমধ্যে ভারতের দুজন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রয়াণের পর প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেন ইন্দিরা গান্ধী। উনি কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে সরকারের ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

১৯৬৭ সালের লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন ছিল প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম নির্বাচনী পরীক্ষা। কংগ্রেস পার্টি লোকসভায় খুব কম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে এবং সারা দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে ক্ষমতা হারায়। এই নির্বাচনের পরে গান্ধী ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক নীতিগুলির দিকে যেতে শুরু করেন (যে কারণে কংগ্রেস দলের বরিষ্ঠ নেতাদের সাথে বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে তার বিরোধ বাধে)। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ তারই ফলশ্রুতি।

জাতীয়করণের ফলে একদিকে ব্যাঙ্কের ওপর জনসাধারণের আস্থা বাড়ে অন্য দিকে ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দক্ষতা অর্জন করে। সারা দেশের গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের অসংখ্য শাখা থেকে ক্ষুদ্র শিল্প এবং কৃষির মতো অবহেলিত বিভাগগুলির জন্য প্রয়োজন মতো ঋণের জোগান দিয়ে দরিদ্র মানুষকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার চেষ্টা হয়েছিল। সরকার নানারকম দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে উত্তেজনা হ্রাস করতে অনেকটাই সফল হয়। কৃষি ও কুটির শিল্পে ঋণ প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে যে পরিমাণ ক্ষুদ্র ঋণ বিলি করা হয়েছিল অনেক ক্ষেত্রেই সেই ঋণ পরিশোধ হয়নি, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিরুদ্ধে এই খেলাপি ঋণ নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় দরিদ্র মানুষের হাতে নগদ টাকার জোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের ক্রয়ক্ষমতাও বাড়ে। ভোগ্য

পণ্যের চাহিদা বাড়ার ফলে অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়ে। সত্তর আশির দশকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শহরাঞ্চলে একটি শাখা খোলার জন্য অনুমতির পূর্বশর্ত ছিল সেই ব্যাঙ্ককে গ্রামাঞ্চলে চারটি শাখা খুলতে হবে। ভেবে দেখুন, ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সময় সাকুল্যে ৮২৬২ টি শাখা ছিল, সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে লক্ষাধিক। ফলে ব্যাঙ্কগুলি কর্মসংস্থান সৃষ্টিরও বড় উৎস হয়ে উঠেছিল। এছাড়াও ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধির ফলে তহবিলের জোগান বাড়ায় ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ তরান্বিত হয়। সেদিক থেকে দেখলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে এই পর্বটি ছিল আজকের অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তি।

**তৃতীয় পর্ব**

১৯৯১ সালে তৃতীয় ধাপটিতে উদ্দেশ্য ছিল উদার অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে ব্যাঙ্কগুলিকে বাজার অর্থনীতিতে দক্ষ প্রতিযোগী এবং লাভজনক সংস্থা হিসাবে গড়ে তুলে তার সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো এবং বেসরকারি ব্যাঙ্কের ভূমিকা বৃদ্ধি করা। ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ত্রয়োদশ গভর্ণর এম নরসিম্হমের নেতৃত্বে কমিটি ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে প্রথম রিপোর্ট পেশ হয়, সেই সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যাঙ্কে উদারীকরণ শুরু হয়। উদারীকরণের সাফল্য মূল্যায়ন করার জন্য ১৯৯৮ সালে দ্বিতীয় নরসিম্হম কমিটি রিপোর্ট পেশ হয়েছিল। সুপারিশ অনুযায়ী ব্যাঙ্কের পুনর্গঠন, পরিচালনার স্বাধীনতা, নিয়ন্ত্রণকে জোরদার করে ব্যাঙ্কগুলিকে আরও লাভজনক এবং দক্ষ করে তোলার ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

**ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি:**

১) এস এল আর (Statutory Liquidity Ratio) ও সি আর আর (Cash Reserve Ratio) অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বাধ্যতামূলক গচ্ছিত আমানতের হার ৫৩.৫ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে নামিয়ে নগদের জোগান ও ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ২) দারিদ্র দূরীকরণ খাতে স্বল্প সুদে ঋণ সরবরাহের বাধ্যবাধকতা খর্ব করে ব্যাঙ্কের মুনাফা বড়ানো। ৩) ঋণ ও সুদের ওপর ভর্তুকি দেওয়া বন্ধ করা। ৪) ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার কাঠামো পুনর্গঠন করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা হ্রাস করা, স্টেট ব্যাঙ্ক সহ তিন থেকে চারটি বড় ব্যাঙ্ককে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হিসাবে গড়ে তোলা এবং অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোকে একীকরণের মাধ্যমে আট থেকে দশটি জাতীয় এবং সর্বজনীন ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত করা। ৫) অ্যাসেট রিকন্স্ট্রাকসন ফান্ড ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে খারাপ এবং সন্দেহজনক ঋণের দায় কমিয়ে খারাপ ঋণ থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করা। ৬) দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে একমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন করা। ৭) কারেন্ট অ্যাকাউন্ট কনভার্টিবিলিটি (সিএসি) চালু করে দেশীয় মুদ্রাকে বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তর করার স্বাধীনতা দেওয়া। ৮) সংকীর্ণ ব্যাঙ্কিং প্রথা প্রবর্তন করে দুর্বল ব্যাঙ্কগুলিকে বিপদমুক্ত করতে শুধু স্বল্প মেয়াদে তহবিল রাখার এবং ঝুঁকিমুক্ত ঋণ মঞ্জুরির অনুমতি দেওয়া। ৯) ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের আস্থা বাড়ানো এবং আর্থিক ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব এবং দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ঋণ শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে Capital Adequacy Ratio (মূলধনের যথাযথ অনুপাত) রক্ষা করা বাধ্যতামূলক করে বাজারে তাদের শেয়ার বিক্রির অনুমতি দেওয়া। ১০) বর্তমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ব্যাঙ্কিং শিল্পের আইনগুলি যেমন আর বি আই আইন, ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আইন, ব্যাঙ্কিং জাতীয়করণ আইন, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় আইনগুলি পর্যালোচনা ও সংশোধন করা হয়।

এছাড়াও দ্রুত যন্ত্রায়ন, উন্নত প্রযুক্তি, কর্মীপ্রশিক্ষণ, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দূর করা, পেশাদারিত্ব, কর্মীনিয়োগ পর্যালোচনার সুপারিশ করা হয়।

উদারিকরণ নীতির বড় পদক্ষেপ অনুযায়ী কিছু বেসরকারি ব্যাঙ্ককে লাইসেন্স দেওয়া হয় যেগুলো 'নিউ জেনারেশন টেক-স্যাভি ব্যাঙ্ক' হিসাবে পরিচিতি পায়। ইন্দাসইন্ড ব্যাঙ্ক, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এবং এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক প্রাথমিক ভাবে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় যুক্ত হয়। তবে সবসময়ই বেসরকারি ব্যাঙ্ক খুব ভালোভাবে চলছে তা কিন্তু নয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্কের অবলুপ্তি এবং সম্প্রতি ইয়েস ব্যাঙ্কের এস বি আই, এইচ ডি এফ সি ও বন্ধন ব্যাঙ্কের সহায়তায় পুনরুজ্জীবন। আই ডি বি আই ব্যাঙ্কের অবস্থাও খুব ভালো নয়। নরসিম্হম কমিটি সুপারিশ করেছিল যে প্রতিযোগিতা এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য, সরকারি ব্যাঙ্কগুলি অবাধ ও স্বায়ত্তশাসিত হওয়া উচিত যাতে তাদের কর্মসংস্কৃতি উন্নত হয় এবং কর্মচারিরা ব্যাঙ্কিং প্রযুক্তিতে পরিচিত ও শিক্ষিত হয়।

২০০০-'০১ অর্থবর্ষে সরকারি ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্প (ভিআরএস) বাস্তবায়িত হয়। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের (আইবিএ) তথ্য অনুযায়ী মার্চ ২০০০ সালের শেষে সরকারি সেক্টরের ব্যাঙ্কগুলিতে মোট ৮,৬৩,১৮৮ জন কর্মচারি ছিলেন, যার মধ্যে ১,২৪,৭১৪ জন (প্রায় ৮.৭ শতাংশ) স্বেচ্ছা অবসরের জন্য আবেদন করেন। ৩১ ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত মোট ১,০১,৩০০ জন স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করেন। সংখ্যাটি ২০০০ সালের মার্চ মাসের শেষে কর্মীদের মোট সংখ্যার প্রায় ১১.৭ শতাংশ। লক্ষণীয় বিষয়, ২০১০ সালের মধ্যেই সত্তর-আশির দশকে জাতীয়করণ ও সম্প্রসারণের ফলে নিযুক্ত বিপুল সংখ্যায় ব্যাঙ্ককর্মীরা অবসর গ্রহণ করেন এবং ব্যাপক যান্ত্রিকীকরণের প্রেক্ষিতে কিছু আধিকারিক পদ ছাড়া কর্মী নিয়োগ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যায়।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে সরকারি ব্যাঙ্কে কর্মী প্রতি ব্যবসার (বিপিই) পরিমাণ ১৯৯১ সালে ছিল ০.৪৬ কোটি টাকা, ২০০১ সালে বেড়ে হয় ১.৯৭ কোটি টাকা এবং ২০১১ সালে সেই সংখ্যাটি কয়েকগুণ বেড়ে হয় ১১.৭৮ কোটি টাকা। একই ভাবে কর্মী প্রতি মুনাফার (পিপিই) পরিমাণ ১৯৯১ সালে ছিল ০.০০৩ কোটি টাকা, ২০০১ সালে বেড়ে হয় ০.০১০ কোটি টাকা এবং ২০১১ সালে সেই সংখ্যাটি কয়েকগুণ বেড়ে হয় ০.০৭২ কোটি টাকা।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে ২০১৫ সালে সরকারি ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় মোট ৮,৩০,০০০ জন কর্মীর মধ্যে ৩,৫৩,০০০ জন আধিকারিক এবং ৩,৩০,০০০ জন করণিক। করণিক এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মী সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ার ফলে ব্যাঙ্কে কর্মচারি ইউনিয়নের সক্রিয়তা ব্যাহত হয়েছে। এই কারণেই বড় বড় বেসরকারি ব্যাঙ্কে কোনও কর্মচারি ইউনিয়ন নেই। কর্মচারি ইউনিয়নের দুর্বলতা এবং ফলতঃ মধ্যস্থতা করার ক্ষমতা কমে যাওয়ায় সরকার এবং কর্তৃপক্ষ নরসিম্হম কমিটি রিপোর্টের সুপারিশগুলো পর পর বাস্তবায়ন করছে।

২০১৭ সালে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তার সহযোগী পাঁচটি ব্যাঙ্ক এবং ভারতীয় মহিলা ব্যাঙ্ককে অধিগ্রহণ করে। ২০১৯ সালে বিজয়া ব্যাঙ্ক এবং দেনা ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদার সাথে একীভূত হয়। বর্তমান আর্থবর্ষে ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সাথে একীভূত হয়েছে। ক্যানারা ব্যাঙ্ক এবং সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক মিলিত হয়েছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সাথে অন্ধ্র ব্যাঙ্ক ও কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক একীকরণ হয়েছে। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক একীভূত হয়েছে। ফলে এই ব্যাঙ্কগুলোর বহু শাখা একীভূত হবে এবং কর্মীসংখ্যা কমে যাবে। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তার জন্য খরিদ্দারের খোঁজ চলছে।

নরসিম্হম কমিটির সুপারিশ ছিল ছোট ছোট ব্যাঙ্কের একীকরণ করে আটটি শক্তিশালী ব্যাঙ্ক গঠন করা। বিগত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি সরকারি ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদ ১২ থেকে ২০ শতাংশে পৌঁছে গেছে, যা কিনা সর্বোচ্চ ৮ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয়। এখনও পর্যন্ত যত ব্যাঙ্ক একীকরণ হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলোই অনুৎপাদক সম্পদ ও আর্থিক লোকসানের ফলে সংকুচিত ব্যাঙ্কিং (Narrow Banking) -এর আওতায় চলে গিয়েছিল, যাদের সঙ্গতি বাড়ানোর স্বার্থে দীর্ঘমেয়াদি আমানত গ্রহণ এবং ঋণ দেওয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। সরকারের ইচ্ছে অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ব্যাঙ্কের সঙ্গে অসচ্ছল ব্যাঙ্কের মিলন ঘটিয়ে ঋণের যোগান বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। অনেক অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞের মতে এই প্রক্রিয়ার ফলে সম্মিলিত ব্যাঙ্কগুলোও দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এতসব কর্মকান্ডের পরেও দেখা যাচ্ছে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় আশানুরূপ উন্নতিসাধন হয়নি, অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সরকারি ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। নরসিম্হম কমিটি রিপোর্টে ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারি ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। কিন্তু সরকার, বিশেষত বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করে অসাধু ব্যবসায়ীদের ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। আর্থিক অপরাধীরা ব্যাঙ্কের সম্পদ তছরূপ করে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। দেশে অর্থনৈতিক মন্দার ফলে ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদ (এনপিএ) বিগত কয়েক বছরে বহু গুণ বেড়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ২০০১ সালে ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ ছিল ৬৩ হাজার কোটি টাকা, সমগ্র ঋণের ১২%, ২০১০ সালে ছিল ৮২ হাজার কোটি টাকা, সমগ্র ঋণের ২.৫%, ২০১৯ সালে হয়েছে ৮.৫২ লক্ষ কোটি টাকা, সমগ্র ঋণের ৯.১%, ২০২০ সালে যা দাঁড়িয়েছে ১১.৩% -এ । ২০২১ সালের অর্থবর্ষে কোভিড-১৯ অতিমারীর প্রভাবে ব্যাঙ্কের এন পি এ ১৩ থেকে ১৪ শতাংশে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক, সরকারের কাছে কোন আশু সমাধান নেই। তদুপরি বিগত পাঁচ ছয় বছরে স্বশাসিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজে সরকার নাক গলাচ্ছে। এই সময় কালে সরকার দুজন দক্ষ গভর্ণরকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেছে, বর্তমানে একজন অদক্ষ বংশবদ আমলা গভর্ণর পদে বসে সরকারি আদেশ পালন করে চলেছেন। সমস্যার সমাধান করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা সরকারের হাতে নেই।

বিপ্লব বসু
কলকাতা, জুলাই ২৬, ২০২০

যোগাযোগ : 9831172060
nagarikmancha@gmail.com

[এই বিষয়ে লেখকের মতামত ছাড়া আরো কিছু বক্তব্য থাকতেও পারে। কেউ লিখতে চাইলে নাগরিক মঞ্চের সাথে যোগাযোগ করুন।]